স্মৃ । তি । ও । কী । র্তি

আপনজনদের শামসুর রাহমান

বদরুল আলম নাবিল

কবিরা মানুষ হিসেবে খুব বড় হবেন, এটা হতেও পারে নাও পারে। পাশ্চাত্য পন্ডিত ইওন তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে 'শিল্পী সত্তা এবং ব্যক্তিসত্তা সবসময় এক সত্তা নয়'। তাই কবি মানুষ হিসেবে বড় হতে পারেন, যেমন মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল; কবি হিসেবে যেমন বড় ছিলেন তেমন মানুষ হিসেবে ছিলেন বড়। অন্যান্য ভাষার মহৎ কবিদের জীবনী পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় ওনারা মানুষ হিসেবেও ছিলেন মহৎ; সাধারণত তাই হয়। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে, অনেক সময় কবি হিসেবে অনেক বড় হতে পারেন কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি হয়তো নাও বড় হতে পারেন। শামসুর রাহমানের মধ্যে দু'টোই ছিলো। ব্যক্তি হিসেবে তার মধ্যে যে অকৃত্রিমতা, মানবিকতা, ভালোবাসা এবং সবার জন্য যে মমত্ব যেমন ছিলো; তার কবিতার মধ্যেও সেই বিষয়গুলো একই রূপে পাওয়া যায়। সেদিক বিবেচনায় দুটো আলাদা নয়, দুটো পরিপূরক এবং দুটো আসলে একই জিনিস। ব্যক্তি জীবনই তার কবি জীবন। তাই শামসুর রাহমানের দু'টি জীবনই উন্নতমানের এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শামসুর রাহমানের কবি জীবনকে আমরা হয়তো চিনতে পারবো তার কবিতা পাঠ করে। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে ভীষণ ভালো মানুষ শামসুর রাহমানকে 'পাঠ' করার সুযোগ আর আমাদের রইলো কোথায়? তবে কবির একান্ত ঘনিষ্ঠ আপনজনরা নানা রূপে চিনেছেন, বুঝেছেন স্বল্পভাষী মিষ্টি চরিত্রের এই মানুষটিকে; তাদের সত্য গল্পগুলো শুনে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে তার কবি সত্তা আর ব্যক্তি সত্তায় কতটা মিল অমিল। এই সুযোগে জেনে নেই কবির জীবনে ঘটে যাওয়া চমকপ্রদ ও মজাদার কিছু ঘটনা। সঙ্গে ব্যক্তি হিসেবে ও কবি হিসেবে তার উত্তরণ আর বন্ধুর পথ পাড়ি দেয়ার কথাও উঠে এসেছে...

বা থেকে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, এম আতিক-উর-রহমান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, কায়সুল হক, কবীর চৌধুরী, শামসুর রাহমান, আলিয়েঁস ফ্রাঁসেজের তৎকালীন ডিরেক্টর, নয়না। পেছনে, নাসির আলী মামুন,এম এ তাহের, টিয়া রাহমান, কবীর চৌধুরীর কন্যা, জোহরা রাহমান ও কবি কন্যা সুমি এবং ফাওজিয়া

'আমার স্বামী আমারই ছিলেন'

জোহরা রাহমান

সুদর্শন কবি শামসুর রাহমানের রমণীভাগ্য বরাবরই ভালো ছিলো। মাতৃভক্ত কবি নিজেই লিখেছিলেন, 'আমার মা আমেনা খাতুন, তার দেখানো পথেই চলি'। তারপর স্ত্রীর ভূমিকায় যাকে পেয়েছিলেন তিনি স্বল্প শিক্ষিত হলেও বাঙালি আর দশটি নারীর থেকে যে আলাদা তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিলো কালে কালে। অন্যদিকে শেষ বয়স পর্যন্ত তার কবিতা, তার ব্যক্তিত্ব বোদ্ধা পাঠকদের পাশাপাশি তরুণীদের হৃদয়কেও ছুঁয়ে গেছে গেছে বরাবর। শোনা যায় বেশ কিছু তরুণীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাও তৈরি হয়েছিলো। এদের মাধ্যমেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নারী মন ও নারী সত্তাকে। সেসবই তার কবিতায় ধরা দিয়েছে নানা ব্যঞ্জনায়। একজন বাঙালি নারীর পক্ষে তার স্বামীর সঙ্গে 'ভিন নারীর' সংসর্গ মেনে নেয়ার কথা নয়। কিন্তু কেন এবং কিভাবে জোহরা রাহমান কোন দিন কোন আপত্তি ছাড়াই মেনে নিয়েছিলেন এসব? কেমন ছিল তাদের দীর্ঘ ৫১ বছর এক ছাদের নিচে বসবাস কাল? আসুন কবি পত্নির কাছেই শুনি...

কবি দম্পতি : ১৯৬৭ সালে

সর্বশেষ বিয়ে বার্ষিকীতে কবি দম্পতির সঙ্গে তাদের জেষ্ঠ্য কন্যা সুমি : ৮ জুলাই ২০০৬

তাঁর বোনের বিয়েতে আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়। আমার বয়স তখন ১৬। নবম শ্রেণীতে পড়ছি। সেই অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে আমার ছোট বোনও ছিলো। সে আমাকে শামসুর রাহমানকে দেখিয়ে বলে, 'ঐ ছেলেটা আপনাকে কেমন করে দেখছে। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।' আমি তাকে গাল দিয়ে বলি, 'তুই এসব কী বলছো?' তখন আমিও তাঁর দিকে তাকালাম। অমনি সুন্দর একটা হাসি দিলেন। তারপর আমি দেখি আসলেই আমি যেখানে যাচ্ছি, তিনিও সেখানে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারটা তাঁর আত্মজীবনী 'কালের ধুলোয় লেখা'তে আছে।

আমার খালা ছিলো তাঁর ভাবি। ওনার সঙ্গে তাঁদের বাসাতে আমি বিয়ের আগে কয়েকবার গিয়েছি। হয়তো তাঁকে দেখার জন্যই গিয়েছি। দেখলেই এক গাল হাসি; তাঁর হাসিটা আমার খুব ভালো লাগতো। একপর্যায়ে তিনি তার ঐ ভাবির মাধ্যমেই বিয়ের প্রস্তাব দেন। আমার বাবা তাকে পছন্দ করেন এবং আমাদের বিয়ে হয় 1955 সালের জুলাই মাসের ৮ তারিখ।

আমার সঙ্গে যখন তাঁর বিয়ে হয় তখন তিনি কবি হিসেবে এতোটা প্রতিষ্ঠা পাননি। বলা যায়, ফুলটাইম বেকার। কিন্তু আমার বাবার মনে হয়েছিলো একদিন তিনি অনেক বড় কবি হবেন। জীবনে উন্নতি করবেন। বাবা তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনিও বাবাকে অনেক শ্রদ্ধা করতেন।

বিয়ের আগে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। কবিতাও পড়া হয়নি। তখন তিনি আমাকে ডাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন সেটাও আমার হাতে এসে পৌঁছায়নি। আমাদের বিয়েটা খুব জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছিলো। প্রায় এক মাসব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন আমার শ্বশুর তাঁর বেকার ছেলের বিয়েতে। তখন তাঁদের একটা গাড়ি ছিলো খুব সুন্দর। সে গাড়িতে করে আমি শ্বশুরবাড়ি এসেছিলাম। বিয়ের সময় অনেক দামি শাড়ি দিয়েছিলেন।

বিয়ের সময়ে একটা স্মৃতি আমার প্রায়ই মনে পড়ে। তাঁর ছোট ভাই সাইফুর রাহমান; আমরা ডাকি তারা বলে। সে আমার স্বামীকে কোলে তুলে আমাদের ঘরের বিছানার কাছে নিয়ে যায়। বিছানা জুড়ে ফুল ছড়ানো ছিলো। পুরো ঘরটা সুগন্ধে ভরা ছিলো। তারপর আমাদের এক গ্লাস দুধ দেয়া হলো। তার অর্ধেক তিনি খেলেন এবং বাকিটা আমি। তারপরে নামাজ পড়ে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আমি একটা নথ পড়েছিলাম। সেটা তিনি খুলতে গিয়ে আমার একটু ব্যথা লেগেছিলো। তিনি তা বুঝতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তারপর ব্যথা কমানোর জন্য তিনি অনেক আদর করলেন। বিয়ের পর তিনি এক সেকেন্ডের জন্যও আমাকে না দেখে থাকতে পারতেন না।

আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিলো তখন তিনি একরকম বেকার। আর্থিক সচ্ছলতা খুব একটা ছিলো না। যখনই তিনি কোনো টাকা পেতেন বই নিয়ে আসতেন এবং আমাকে দুঃখ করে বলতেন 'তোমাকে তো কখনো কিছুই দিতে পারলাম না।' তখন আমি বলতাম, 'আমার কিছু লাগবে না। আপনি বই নিয়ে এসেছেন তাতেই আমি খুশি।' পরে যখন চাকরি পেলেন তখন বেতনের সব টাকা এনে তিনি আমার হাতে দিতেন।

আমার স্বামী কখনো আমার সঙ্গে মুখ কালো করে কথা বলেননি। সব সময় আমাকে 'জোহরা জোহরা' বলে ডাকতেন। আমাকে একটু দেখতে না পেলেই খোঁজ করতেন। আমাকে তিনি রানীর মতো করে রেখেছিলেন। এগুলো আমি ভুলতে পারি না। আমরা যখন যৌথ পরিবারে ছিলাম তখন আমার শাশুড়ি প্রায়ই খাবার সময় আমি খেয়েছি কিনা জানতে আসতেন। না খেলে তিনি বলতেন, 'মা খাও, খেয়ে নাও।' আমার শ্বশুরও আমাকে খুব আদর করতেন। সালমা, নীলু, শানু , সীমা (শামসুর রাহমানের ৪ বোন) সবাই আমাকে আদর করতো।

আমাদের বড় মেয়ে সুমীর জন্ম হলে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। তার দুধের কৌটো থেকে শুরু করে সব কিছু কিনতে তার খুব ভালো লাগতো।

তিনি প্রায়ই রাতে দেরি করে বাসায় ফিরতেন। আমাদের বাসায় তখন একটা বড় বারান্দা ছিলো। আমি সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতাম। এ নিয়ে আমার কখনো রাগ হতো না। তারপর তিনি যখন ফিরতেন আমি তখন অভিমান করে বলতাম, 'প্রতিদিন আপনি এতো দেরি করে আসেন আমার ভালো লাগে না।' তিনি তখন আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলতেন, 'সরি।' তিনি সরি বলার সঙ্গে সঙ্গে

আমার রাগটা আর থাকতো না।

তিনি রাতে ফেরার পর যদি কখনো আবার লাইট জ্বালিয়ে কবিতা লিখতে বসতেন তাতে আমার সমস্যা হলেও আমি কখনো বলতাম না। কেননা তাঁর শুধুমাত্র হাঁটাটা দেখেই আমার মনে হতো তিনি একদিন অনেক বড় কবি হবেন। ঘরময় হাঁটতেন আর বাতাসে আঙুল চালিয়ে যেন কিছু একটা লিখতেন।

তিনি যে কবিতাগুলো লিখতেন আমাকে ডেকে সেগুলো পড়ে শোনাতেন। আমাদের মেয়েদের বা ছেলের বউ টিয়ার বাসায় ফিরতে একটু দেরি হলেই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। দুই মেয়ে সেবা কানাডায় আর ফাওজিয়া আমেরিকায় থাকে; ওদের কথা খুব মনে করতেন। মেজো মেয়েকে তিনি বলতেন, 'আর কি তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে?' ওর স্বামীর সঙ্গে কথা বলার সময়েও তিনি খুব কাঁদতেন।

আমার স্বামী খুব হাসিঠাট্টাপ্রিয় ছিলেন। আমার ছোট বোন তার দুলাভাই মানে আমার স্বামীর সঙ্গে অনেক ঠাট্টা করতো।

যুবক বয়সে তিনি খুব সুন্দর ছিলেন। তাই অনেক মহিলাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো, অনেকেই বাসায় ফোন করে আমাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করতে চাইতো, সম্পর্কে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করেছিলো। বলতো আপনার স্বামীকে আজকে অমুক জায়গায় অমুক মেয়ের সঙ্গে দেখেছি। কিন্তু আমি কখনো সেগুলোকে গুরুত্ব দেইনি। কেননা আমি জানতাম, কবিদের অনেকেই পছন্দ করেন। তাঁদের কবিতা পছন্দ করেন। আমি আরও একটা বিষয় খুব স্পষ্ট করে জানতাম, তিনি আমাকে ভালোবাসেন। তাই তাঁর কাছে আমি কখনো এ বিষয়গুলো তুলিইনি। আমার শ্বশুর তার সঙ্গে এসব নিয়ে ঠাট্টা করতেন। উপদেশ দিতেন। কিন্তু আমি বলিনি।

উনি বিভিন্ন মেয়েদের নিয়ে কবিতা লিখতেন। কবিতায় সেসব মেয়েদের শারীরিক সৌন্দর্যের বর্ণনাও থাকতো। এ ব্যাপারেও কখনো আমার কোনো অভিযোগ ছিলো না। আমি তাঁকে আরও উৎসাহ দিতাম। মাঝে মাঝে অভিমান করে বলতাম, 'আপনি খালি অন্যদের নিয়ে কবিতা লেখেন।' উনি হাসতেন। বলতেন, 'জোহরা, তুমি কী যে বলো, তুমিই তো আমার সব।'

একবার এক মেয়ে ওনার হাত ধরার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছিলো। আমি অনুমতি দিয়েছিলাম। তার হাতটা ধরার জন্য অনেকে আগ্রহ পোষণ করতেন। তিনি এ রকমই মানুষ ছিলেন।

তিনি আমার সঙ্গে প্রায়ই বিয়ের গল্প করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'তুমি খুব সুন্দর।' রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে দেখতাম তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার ডায়াবেটিস হওয়ার পর তিনি প্রায়ই বলতেন, 'তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো করো।'

বিয়ের পর তিনি প্রথম কথা বললেন বাসরঘরে। বাসরঘর আমার শ্বশুরবাড়িতে হয়েছিলো। ঘরটা অনেক ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিলো। তিনি বললেন, 'ঘরটা পছন্দ হয়েছে তোমার?' আমি কিছু বলতে পারিনি লজ্জায়।

শেষ বয়সে তিনি এক সেকেন্ডের জন্যও আমাকে চোখের দূরে যেতে দিতেন না। রান্না ঘরে গেলেও ডেকে পাশে বসিয়ে রাখতেন

বিয়ের পরপরই তিনি আমায় নিয়ে একটি কবিতা লিখলেন; নাম ছিলো 'জোহরার জন্য'। আরও অনেক কবিতা তিনি আমাকে নিয়ে লিখেছেন।

তাঁর কবিতা লেখার নির্দিষ্ট কোনো সময় ছিলো না। সব সময়ই তিনি ভাবতেন। এমনও হয়েছে তিনি ঘুম থেকে জেগে লিখতে বসে গিয়েছেন। তিনি বুকের মধ্যে বালিশ নিয়ে পা'টা লম্বা করে উপুর হয়ে লিখতেন। এটা দেখতে খুব সুন্দর লাগতো।

বিয়ের আগে তাঁর লেখা চিঠিটা তো আমি পাইনি। বিয়ের পরে তিনি যখন পশ্চিম বাংলায় ছিলেন তখন তিনি আমাকে খুব সুন্দর করে চিঠি লিখতেন। তিনি লিখতেন, ঘুমুতে যাবার সময় আমার মুখটা তাঁর চোখে ভেসে ওঠে। যাবার সময় আমাকে তাঁর মনে পড়ে। তিনি আরও সুন্দর করে অনেক কথা বলতেন। দুঃখের বিষয় হলো, একবার খুব বৃষ্টিতে অনেক বই এবং তাঁর লেখা চিঠিগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তাঁর লেখা 'কখনো আমার মাকে' কবিতাটি আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। তিনি যখনই কোনো কবিতা লিখতেন, আমাকে পড়ে শোনাতেন। হয়তো আমি কাজ করতাম আর তিনি কাগজটা নিয়ে পড়ে শোনাতেন। শুনে আমি বলতাম, 'খুব সুন্দর হয়েছে। তবে আরও ভালো লিখতে হবে।'

প্রথম দিকে আমরা আর্থিকভাবে সচ্ছল না থাকলেও যা ছিলো তাতে আমরা সবাই সন্তুষ্ট ছিলাম। আমার বড় মেয়ে এবং ছোট মেয়ের মধ্যে তাঁর প্রভাবটা বেশি। ছোট মেয়ে একবার ১২টা খুব সুন্দর কবিতা লিখেছিল। ওনাকে বললাম ওগুলো 'বেগম' পত্রিকায় ছাপিয়ে দিতে। তাতে মেয়েটা উৎসাহ পাবে। ওনি বললে অবশ্যই ছাপতো, কিন্তু উনি বলেন নি। হয়তো উনি ওগুলোকে মান উত্তীর্ণ কবিতা মনে করেন নি।

আমি কখনো কবিতা লিখিনি। ওনার সামনে তাঁর কবিতাগুলো আবৃত্তি করার চেষ্টাও করিনি। এক ধরনের সংশয় আমার মধ্যে কাজ করতো যে, আমি এতো বড় কবির স্ত্রী। ওনার মতো কিছু না করতে পারলে মানুষ কী বলবে? এটা ভেবে আমি সেসবের দিকে পা বাড়াইনি।

তিনি অনেক প্রেমের কবিতা লিখেছেন। আমার কখনো মনে হয়নি তিনি অন্য কাউকে উদ্দেশ করে এসব লিখেছেন। কেননা আমি পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে বলতে পারি, 'আমার স্বামী আমার।'

একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তখন তিনি পশ্চিম বাংলায় ছিলেন। তিনি আমার অসুস্থতার কথা শুনে সারা রাত কেঁদেছেন, কপাল ঠুকেছেন। পরের দিন সকালে প্লেনে চলে এলেন, ওনার সফর সঙ্গীর কাছে শুনেছি অসুস্থতার খবর পাওয়ার পর থেকে পরের দিন আমার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত পুরোটা সময়ই তিনি কেঁদেছেন।

খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অনেক শৌখিন ছিলেন। মাংস, খাসির চাপ ভুনা, লাউয়ের ক্ষীর খুব পছন্দ করতেন। তিনি আমার রান্না খেলেই বুঝতে পারতেন। কোনো দিন হয়তো কোনো কারণে আমি কিছু একটা রান্না করিনি, অন্য কেউ করেছে। তিনি ঠিকই সেটা বুঝতে পারতেন।

বিয়ের আগে তিনি বেশ অগোছালো ছিলেন। ঠিকমতো গোসল করতেন না, নখ কাটতেন না, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতেন না। বিয়ের পর আমি তাঁর নখ কেটে দিতাম। তিনি উহ্ লাগছে বলে চিৎকার করতেন। আমি কাপড় ধুয়ে দিতাম। তাকে বাথরুমে নিয়ে পানি ঢেলে দিতাম। তিনি ঠাণ্ডায় লাফিয়ে উঠতেন। চুল আমি আঁচড়ে দিতাম। আমি যে কাপড়টা দিতাম সেটাই তিনি পরতেন।

তিনি নিজের কাপড় তেমন না কিনলেও আমার জন্য মাঝে মাঝে শাড়ি নিয়ে আসতেন। একবার খুব সুন্দর একটা হার নিয়ে এসেছিলেন।

বিয়ের পর তাঁর সঙ্গে আমি অনেক জায়গায় বেড়াতে যেতাম। অনেক রাত পর্যন্তও আমরা বাইরে বেড়িয়েছি। তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে প্রায়ই আমরা রাত ১২টা থেকে ১টার দিকে বাসায় ফিরেছি। সেই আড্ডায় গান, কবিতা হতো নানা প্রসঙ্গে সবাই কথা বলতো।

একবার এক আড্ডাতে একজন আমাকে বলল, 'আপনি কি শামসুর রাহমানের দ্বিতীয় স্ত্রী?' আমি অবাক হয়েছিলাম, রেগে গিয়েছিলাম। আমি তখন অনেক স্লিম ছিলাম। বয়স অল্প মনে হতো, তাই– হয়তো তিনি এ কথা বলেছিলেন। আমার চোখ, মুখ বসা ছিলো। এ ব্যাপারটা আমার স্বামীর ভালো লাগতো। আমি এ নিয়ে হাসতাম। তিনি বলতেন, 'বুঝবে না, বিদেশে এটাকেই বিউটি বলে।' আমার 'বিউটি বোন' উনি পছন্দ করতেন।

তিনি প্রায়ই বলতেন, 'তোমার চোখটা খুব সুন্দর। হাসিটা সুন্দর।' আমি তখন আরও খিলখিলিয়ে হাসতাম। তিনি তখন বলতেন, 'বেকুবের মতো তুমি হাসছো।' এটা শুনে আমি আরও হাসতাম।

যে ছেলেটা আমাদের মারা গিয়েছে তার মায়া